ন্যায্যতা, সাধু পল ও বাংলাদেশ মণ্ডলী

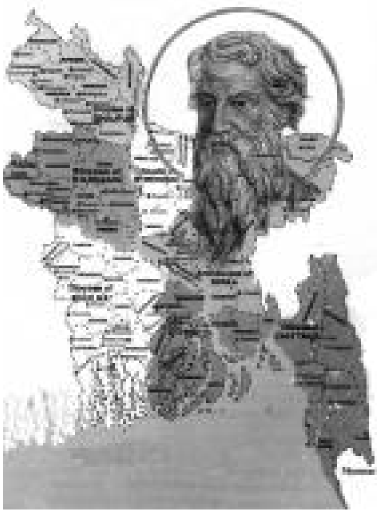

– রূপক ডমিনিক রোজারিও, ও,এম,আই,

ভূমিকা

“সকল মানুষ অমর আত্মা পেয়েছে এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছে; সবার প্রকৃতি ও উৎস এক। খ্রীষ্ট সকলের জন্যই পরিত্রাণ অর্জন করেছেন এবং সবাই একই ঐশ আহ্বান লাভ করেছেন, সবার জীবনের লক্ষ্য একই। এই সব কারণে মানুষ মূলতঃ সমান, তাই এই সমতাকে অধিকতর স্বীকৃতি দেয়া আবশ্যক ” (ভাটিকান দলিল ৫৭৭)। সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা বর্তমান বিশ্বে মণ্ডলীর জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ। প্রতিনিয়ত খবরের কাগজগুলি খুললেই দেখা যায়, মানুষের অধিকার কিভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সমাজে কিভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, মানুষের জীবনকে নিয়ে কিভাবে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে; মনে হয় চারদিকে অন্যায্য কাজের মচ্ছব চলছে। এতসব অন্যায্য কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো খুবই কঠিন। এরূপ পরিস্থিতিতে মণ্ডলীর একটি পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে সমাজের সকলের মর্যাদা ও সমতা আইনের সামনে অক্ষুণ্ন রাখা। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে কেউ সমান হয়ে জন্ম নেয় না, কিন্তু মানব মর্যাদার দিক থেকে কেউ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য দাবি করতে পারে না কারণ সকল মানুষ এক এবং অভিন্ন সৃষ্টিকর্তার অধীনে এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে। তাই ধর্ম, বর্ণ, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি ভিন্ন হলেও মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের বেলায় কোন ভিন্নতা ‘ন্যায্য পৃথিবীতে’ গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথম অধ্যায়

ন্যায্যতা

ন্যায্যতা কি

ন্যায্যতা হল প্রত্যেক মানুষকে তার যা পাওনা, তা প্রদান করা। আক্ষরিক অর্থে ন্যায্যতা বা justice শব্দটি ল্যাটিন শব্দ justitiaথেকে আসে, যার অর্থ হল পরস্পরের প্রতি মানুষের যুক্তিযুক্ত আচরণের বিধান। পরস্পরের প্রতি অধিকার প্রদান আপেক্ষিক ভাবে দায়িত্ব পালনের মানদণ্ড। এখানেই পরিপূর্ণ সামাজিক সমতা বিরাজ করে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের অধিকার ভোগ ও নিজের দায়িত্ব পালন করে এবং অন্যের অধিকার ও দায়িত্ব স্বীকার করে। এ সকল অধিকারের ভিত্তি হলো ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ম কানুন।

ন্যায্যতা তিনটি দিক থেকে বিবেচ্য :

ক) ব্যক্তিগত ন্যায্যতা

খ) দলীয় ন্যায্যতা

গ) সামাজিক ন্যায্যতা

ব্যক্তিগত ন্যায্যতা হল একটি গুণ ও মূল্যবোধ, একটি অভ্যাস যা একজন ব্যক্তি সচেষ্টায় নিজের মধ্যে গড়ে তোলে। ন্যায্যতার অধিকারী একজন ব্যক্তি সবসময়

নিজের আচার-আচরণে ও কাজকর্মে অন্যের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। সে যখন অন্যের প্রতি তার ন্যায়পরায়নতা প্রদর্শন করে তখন সে অন্যের মূল্যবোধ বা গুণ তার আচরণের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে না। ব্যক্তিগত মূল্যবোধের পর্যায়ে একজন ন্যায়বান ব্যক্তি সর্বদা অন্যের অধিকারকে সম্মান করে।

দলগত ন্যায়পরায়নতা দুই বা অধিক ব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান থাকে। এরূপ ন্যায্যতা বলতে আমরা বুঝে থাকি 'দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ' ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে যথার্থতা, নির্ভুলতা ও সমতা বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। দলগত ন্যায্যতা সকল প্রকার বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক নির্দেশ করে থাকে। এক কথায় বলতে গেলে, দলগত ন্যায্যতা হল ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক থাকে ঠিক সেরূপ। এ ধরণের ন্যায্যতা সাধারণত রাষ্ট্রিয় আইন দ্বারা পরিচালিত ও যে কোন পর্যায়ে তা পালনীয়।

ব্যাপক অর্থে সামাজিক ন্যায্যতা বলতে যে কোন ধরনের যথার্থ ও ন্যায় কার্যকে বুঝায়। ন্যায্যতা হল, একটি সামাজিক সৎকর্ম ও মূল্যবোধ, যা একটি সুশৃঙ্খল সমাজের দিগ্‌নির্দেশক। একটি সমাজের ভাল-মন্দ নির্ভর করে সমাজে কতটুকু শৃঙ্খলা বিরাজমান। সামাজিক ন্যায্যতার অন্য কোন মানদণ্ড নেই শুধুমাত্র মনুষ্যত্বকে কেন্দ্র করে সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে।

আমরা ন্যায্যতাকে যেভাবেই ভাগ করি না কেন, ন্যায্যতার দার্শনিক ভিত্তি হল, প্রাকৃতিক নিয়ম যা সকল মানুষের নৈতিক আচরণের পন্থা। ন্যায্যতার মধ্যে মানব মর্যাদা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় কারণ মানব মর্যাদা হল সকল নৈতিক কাজের উৎস।

ন্যায্যতা ও মানবাধিকার

'জগতে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করাই হল অন্যতম মূল লক্ষ্য যার জন্য আল্লাহ তাঁর বাণী ও পথপ্রদর্শকদের পাঠিয়েছিলেন' (আলকুরান, সুরা হাদিস ৫৭:৭৬)। ঈশ্বর যা-কিছু দান করেন তার সবকিছুর উপর সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতেরাও ধন-সম্পদের সম-অধিকারী। প্রত্যেকটি সমাজে ন্যায্যতা ও মানবাধিকার ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন, তা ভোগ করা বা সুবিধা লাভ করার অধিকার তার রয়েছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। এ সকল অধিকারগুলির পূর্ণতা হল ন্যায্যতা। যখন মানুষ তার এই অধিকার লাভের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না তখন অন্যায্যতা সমাজকে গ্রাস করে। মানুষের অধিকার হল, কোন বিশেষ কিছু করতে, রাখতে ও অর্জন করতে অলঙ্ঘনীয় নৈতিক ক্ষমতা।

মানবাধিকার ও ন্যায্যতা ওতোপ্রোতভাবে থাকলে মানুষের দায়িত্ববোধ –এ দুটির মাঝামাঝি অবস্থান করে। কারণ যেখানে মানবাধিকার বিদ্যমান সেখানে দায়িত্ববোধ আবশ্যিক। তা না হলে মানুষের অধিকারটা হবে বানরের গলায় মুক্তার মালা ঝুলিয়ে দেওয়ার মত, যেখানে ন্যায্যতার কোন স্থানই থাকবে না। আমরা একজনের অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করলে, অন্য ব্যক্তির প্রতি তার দায়িত্বের বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হয়, অন্যথায় সেখানে অন্যায্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। সমাজে প্রতিটি মানুষ যেমন স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে, সেরূপ তারা ন্যায়পরায়নতার মাধ্যমে তাদের অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখার দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকে। তা করতে গিয়ে তাদেরকে অবশ্যই সকল প্রকার ব্যবধান এড়িয়ে গিয়ে মনুষ্যত্বকে প্রাধান্য দিতে হয়। মানুষের মনুষ্যত্ব তখনই সার্থক হয় যখন সে তার জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা ভোগের অধিকার, নিরাপত্তা, খাদ্যের অধিকার ইত্যাদি তার জীবনে উপভোগ করতে পারে। একটি সমাজে যখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও দলীয় অধিকার সমবিরাজমান থাকে সে সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজের কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই অন্যের চেয়ে অধিকতর অধিকার ভোগ করতে পারে না; সেখানে অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে সমতা থাকতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের অধিকতর অধিকার ভোগ যদি সমাজের অন্য সকলের মঙ্গল সাধিত হয় তবে তা অবশ্যই অন্যায্য কোন বিষয় হতে পারে না।

মানবাধিকার ও ন্যায্যতা প্রকৃতির নিয়ম থেকে উদ্ভূত। তাই মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার প্রকৃতিগত।

কিন্তু সমাজে কোন মানুষ কোন্ অবস্থায় বেঁচে থাকবে, তা নির্ধারণ করতে গেলে ন্যায্যতার বিষয়টি উঠে আসে কারণ ন্যায্যতা যদি সমতা হয়, তাহলে সমাজের সকলকে একই সুবিধা প্রদান করতে হবে। তবে ন্যায্যতার কথা বলে সব ধরনের অধিকার সমানভাবে সকলের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। একজন দরিদ্র মানুষের ক্ষেত্রে খাদ্যের অধিকার যে গুরুত্ব পাবে, একজন ধনীর ক্ষেত্রে তা অবশ্যই একই হবে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে সমাজে যখন দলগত অধিকার ও ন্যায্যতার প্রশ্ন আসে তখন ব্যক্তিগত অধিকারের গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও মানবাধিকার বিষয় দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে মানুষের মৌলিক অধিকার অর্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে ন্যায্যতার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না, তা হলে ন্যায্যতা আর ন্যায্যতা থাকে না।

ন্যায্যতা ও পবিত্র বাইবেলের কথা

পবিত্র বাইবেলকে ঈশ্বরের ন্যায্যতার বহি:প্রকাশ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। অনেকে মনে করেন যে, বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচ্য ন্যায্যতা বাইবেলের কোন উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় হতে পারে না। কিন্তু দেখা যায় যে, ঈশ্বরের ন্যায়-নিষ্ঠতা হল বাইবেলের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। তবে পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে আমরা ন্যায্যতা সম্পর্কে দুটি ভিন্ন ধারণা পেয়ে থাকি।

পুরাতন নিয়ম ও ন্যায্যতা

ন্যায্যতার ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়ম নতুন নিয়ম থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী চিত্র তুলে ধরে। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি যে, নিয়ম-কানুন, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক প্রণালী উল্লেখযোগ্য ভাবে ব্যতিক্রমী। বিশেষ ক'রে প্রবক্তাদের লিখিত পুস্তকগুলিতে দেখা যায় যে, ঐশ্বরিক ন্যায্যতাকে ঐতিহাসিক অন্যসব-কিছু থেকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ ইস্রায়েল জাতি ছিল ঈশ্বরের মনোনীত জাতি এবং ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী পরিকল্পনা বা ন্যায্যতায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত জীবনেই নয় বরং সামগ্রিকভাবে তাদের জাতীয় জীবনে। আমরা নতুন নিয়মে পুরাতন নিয়মের ন্যায় বিস্তারিত সামাজিক বিধি-নিয়ম সংক্রান্ত ঈশ্বরের আদেশ-নির্দেশগুলি খুঁজে পাই না, যা পরিষ্কারভাবে সামাজিক ন্যায্যতার বিষয় তুলে ধরে। তাই দেখা যায়, আমাদের খ্রীষ্টবিশ্বাস ন্যায্যতার জন্য পুরাতন নিয়মের উপর অনেক নির্ভরশীল।

পুরাতন নিয়মের ঐশপ্রত্যাদেশ হল, যীশু খ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশের পূর্বে বা প্রাথমিক পর্যায়। এটা এভাবে দেখা যায় যে, ঐশরাজ্য ও এই পৃথিবী, ইস্রায়েল জাতির বিশ্বাস ও তাদের জাতিগত পার্থক্যগুলি খুব স্পষ্ট নয়। ইস্রায়েল জাতির নিয়ম-কানুনগুলি ছিল তাদের ধর্মীয় নিয়ম-নীতি এবং ধর্মীয় নিয়ম-নীতি ছিল তাদের রাষ্ট্রীয় বিধি-নির্দেশ। তাই তাদের ঐক্য একাধারে ছিল রাষ্ট্রীয় ঐক্য, অপরদিকে ছিলতাদের ধর্মীয় ঐক্য। তাছাড়া নৈতিক নিয়মগুলি ধর্মীয় নিয়মের সাথে আবদ্ধ ছিল, যা প্রকাশ পেত যাজকদের উপাসনার নিয়ম-নীতি, মন্দিরের আচার-আচরণ ও শুচিকরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তাই এক্ষেত্রে ন্যায্যতা যা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে বিরাজমান ছিল– কখনোই উপাসনার নিয়ম-নীতি থেকে আলাদা করা যেত না। এছাড়াও ইস্রায়েল জাতির ন্যায় বিধান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ লাভ করে, যেমন, বিচারকদের আমলের ন্যায্যতা রাজাবলী গ্রন্থে অন্যরূপ ধারণ করে, যা আবার নির্বাসনের পরবর্তী সময়ে ভিন্ন রূপ লাভ করে।

পুরাতন নিয়মের ন্যায্যতা সম্পর্কে পরিষ্কার উদাহরণ হল, যাত্রা পুস্তকের ২২:২০ অংশতে, যেখানে প্রবাসী, এতিম, বিধবা, প্রতিবেশী এমনকি শত্রুর প্রতি ন্যায্যতা প্রদর্শনের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া এখানে ন্যায্যতার কথা বলতে গিয়ে অন্যের প্রতি দয়া ও সহযোগিতার বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে ঈশ্বরের ন্যায়পরায়নতা বুঝাতে শুধুমাত্র বিধি-নিয়ম নয় বরং ভালবাসা ও দয়ার মিশ্রিতরূপকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেশীর প্রতি সমতার ধারণা নিয়েই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা যথেষ্ট নয় বরং দয়া ও ভালবাসার স্থান দিয়ে ন্যায্যতাকে পূর্ণ করার আহ্বান আমরা লেবীয় পুস্তকে দেখতে পাই ১৯:৯-১৭ অংশে। তোমার প্রতি অন্যের ব্যবহার কিরূপ হবে শুধু তাই নয় বরং অন্যের প্রতি তোমার কি করণীয় তাও বিবেচ্য (তোবিত ৪:১৪-১৭)।

পুরাতন নিয়মে সামসঙ্গীতগুলিতে ন্যায্যতার বিষয় স্পষ্ট(সাম ১৪৬:১৬-১৭; ১১২:১,৩,৯; ৩৭:৬; ৪৫:৪; ৭২:১)। প্রবাদ-প্রবচন গ্রন্থেও লেখক দার্শনিকের মত বলেন, "ধর্মময়তা ও ন্যায় অনুশীলন করা প্রভুর কাছে বলিদানের চেয়ে গ্রহণীয়'। প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে ন্যায্যতা ও দয়ার বিষয়টি খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (ইসাইয়া ৫৮:১-১০)। পুরাতন নিয়মে প্রবক্তা আমোসকে বলা হয় 'ন্যায়পরায়নতার প্রবক্তা' যিনি তার প্রাবক্তিক ঘোষণায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যায্যতার কথা প্রচার করেছেন (আমোস ৫:১৪-১৫; ২১-২৪)।

পুরাতন নিয়মে বহু নীতি-বিধান দ্বারা ন্যায্যতার বিষয় তুলে ধরা হলেও এক কথায় বলা যায় যে, এই সকল নিয়ম-নীতির মাধ্যমে 'ঈশ্বরের ভালবাসা' সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। দয়াহীন ন্যায্যতা হলো অন্যায্যতা, আর এটাই হল পুরাতন নিয়মের ন্যায্যতার মূল বিষয়।

নতুন নিয়ম ও ন্যায্যতা

ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বিধান কার্যকর হয় শুধুমাত্র মিলন ও ঈশ্বরের ভালবাসা দ্বারা। নতুন নিয়মের ন্যায্যতার ধারণা সাধারণ ন্যায্যতার ধারণা থেকে অনেক বেশী অর্থপূর্ণ এবং মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত করা কঠিন। সাধারণ দৃষ্টিতে ন্যায্যতা হলো সমতা বা যার যা প্রাপ্য তা প্রদান করা। কিন্তু নতুন নিয়মে যীশু খ্রীষ্টের সেই উপমা কাহিনীটি, যেখানে অসম শ্রম ও সমপারিশ্রমিক প্রদান করা হয়, আমাদের মনে ন্যায্যতার নির্ভুলতার বিষয়ে প্রশ্ন জাগিয়ে দেয়। কারণ আমাদের মনে হয়, গল্পের মধ্যে ন্যায্যতা উপেক্ষিত হয়েছে। যারা দিনের শুরু থেকে কাজ করেছেন এবং যারা দিনের শেষ পর্যায়ে এসে কাজ শুরু করে, তাদেরকে একই পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। কিন্তু তারা যা ন্যায্য হিসাবে গণ্য করেছে তার অর্থ এভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, 'তোমার যা পাওনা, তা নিয়ে তুমি যাও; কিন্তু আমি তোমাকে যা দিয়েছি, শেষে যে এসেছে, তাকেও সেই একই মজুরী দিতে ইচ্ছা করি। আমার নিজের যা, তা নিয়ে আমার যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার কি আমার নেই?" নতুন নিয়মের এ ধরনের ন্যায্যতায় আমরা ভালবাসার প্রাধান্য দেখতে পাই।

ঈশ্বরের অবোধগম্য দান হিসেবে ভালবাসা আপাত দৃষ্টিতে ন্যায্যতাবিরোধী মনে হয়। আমাদের কাছে যা অন্যায্যতা, তা কিন্তু ঈশ্বরের কাছে ন্যায্যতা কারণ ঈশ্বর নিজেই ন্যায্যতার ধারক এবং তাঁর অধিকার আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করাই তার কাছে ন্যায্যতা। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে পার্থিব ন্যায্যতা নয় বরং ঐশরাজ্যের ন্যায্যতা প্রকাশ ও বাস্তবায়িত করেন। ঈশ্বরের ন্যায্যতা 'justitia civilis' নয় বরং তা 'justitia evangeliea' যা পার্থিব ন্যায্যতা বিরোধী ভাবধারা সৃষ্টি করে।

একই ধরনের বিষয় উঠে আসে যখন আমরা যীশুর শিষ্যদের ন্যায়পরায়নতার বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করি। যীশু তার শিষ্যদেরকে 'ফরিসীদের ন্যায়পরায়নতার' ঊর্ধ্বে থাকতে আদেশ দেন। শিষ্যদের ন্যায়পরায়নতা এই পৃথিবীর নিয়মকানুন দ্বারা আবদ্ধ নয় বরং তা 'ঈশ্বরের ভালবাসা' দ্বারা আবদ্ধ এবং ভালবাসার সমান (মথি ৫:৪৫-৪৮)। ন্যায্যতা শুধুমাত্র পার্থিব নয়, তা আধ্যাত্মিক ও স্বর্গীয়।

আর একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একজন লোক যীশুর কাছে এসে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগের বিষয় উল্লেখ করেন, তখন তিনি উত্তর দেন, "হে মানুষ, তোমাদের উপরে বিচারকর্তা বা মধ্যস্থকারী আমাকে কে নিযুক্ত করেছে?" (লুক ১২:১৪)। তিনি কিন্তু বলেননি যে, এ ক্ষেত্রে বিচারক বা সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনের প্রয়োজন নেই, তিনি বলতে চেয়েছেন যে, ঐশ্বরিক ন্যায্যতা পার্থিব ন্যায্যতার সমান নয়। ন্যায্যতার পার্থিব অর্থ দ্বারা আমরা ঐশ্বরিক অর্থকে কলুষিত করতে পারি না। কারণ 'ভালবাসাই' হল ঈশ্বরের সাথে মানুষের নব-সন্ধির ন্যায্যতার সারবস্তু।

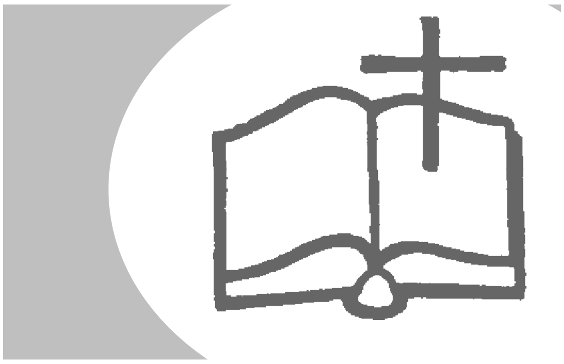

দ্বিতীয় অধ্যায়

ন্যায্যতা ও সাধু পল

সাধু পল ও ন্যায্যতা

সাধু পলের জীবনে খ্রীষ্টসেবার আহ্বান ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একটি ঘটনা। খ্রীষ্টসেবায় তিনি নিজেকে এত গভীর ভাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন যে, যখন তিনি নির্যাতিত হয়েছেন তিনি নিজেকে নির্যাতিত নির্যাতনকারী খ্রীষ্টসেবক হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। খ্রীষ্ট কর্তৃক 'ভালবাসার' উপর প্রতিষ্ঠিত ন্যায্যতার কথা বলতে গিয়ে পলকে অনেকবার অনেক অপমান, অন্যায় আচরণ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তিনি ন্যায্যতার কথা বলতে গিয়ে অধিকাংশ সময়ই ইহুদী সমাজের বিভিন্ন বিধি-নিয়মের বিষয়ে যুক্তি-তর্ক করেছেন। ফরিসীরা যেখানে 'justitia civilis' বিষয়টির উপর ভিত্তি করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা সম্পূর্ণ পার্থিব।

তাই যীশু যখন ঐশতাত্ত্বিক ন্যায্যতার কথা প্রচার করেন, তখন তারা যীশুকে অস্বীকার করে।

পলের ন্যায্যতার ভিত্তি

ইহুদী সমাজে এরূপ পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছিল ন্যায্যতার ভিত্তি কি হবে ?

১. ন্যায্যতা হবে নতুন নিয়ম অনুযায়ী ঐশরাজ্য লাভের আশায় ঈশ্বরের সাথে মানুষের ভালবাসার সম্পর্ক।

২. ন্যায্যতা হবে যা পার্থিব, যা পুরাতন নিয়মের নিয়ম-নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

পল ইহুদী সমাজের ন্যায়পরায়নতা যেভাবে উপস্থাপনা করেছেন তা হল যে, নিয়মনীতি পালন এবং আইন দ্বারা নির্দেশিত কাজের মাধ্যমে একজন ন্যায়বান ব্যক্তি হতে পারেন এবং এভাবে সেই ন্যায়বান ব্যক্তি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে পরিত্রাণ পেতে পারেন। এভাবে ন্যায্যতা ও ঈশ্বরের পরিত্রাণ ও দয়া লাভের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে ইহুদী সমাজের বিচার-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পল দেখান যে, ইহুদীদের এরূপ মতবাদ ও ঐশবাণীতে প্রদত্ত ন্যায়পরায়নতার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। তিনি ন্যায্যতার সম্পর্কে যা বলেন তা হল :

১. শুধুমাত্র নিয়মকানুন সত্যতা বা ন্যায্যতাকে প্রতিপাদন করতে পারে না, কারণ নিয়ম অধিকাংশ সময় মানুষের জীবনে বাধার সৃষ্টি করে (রোমীয় ৭:৭-২৫)। মানুষ অপরাধী বা পাপী বলেই যে তাদের জীবনে নিয়মকানুনের প্রয়োজন রয়েছে তা নয় বরং বিধান রয়েছে বলেই মানুষ পাপী বলে প্রতিপন্ন হয়। বিধান শুধু ন্যায্যতার কথা বলতে পারে কিন্তু তা তাদের জীবনে পালন করার ক্ষমতা বা শক্তি দেয় না। তাই পল বুঝাতে চান যে, সাধারণ নিয়মকানুন অনেক সময় ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ককে উল্টোদিকে পরিচালিত করে।

২. রোমীয়দের কাছে পত্রে পল ন্যায্যতার কথা বলতে গিয়ে 'ঈশ্বরের ন্যায়পরায়নতা'কে মূল বিষয় হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি এখানে ন্যায্যতা বলতে সর্বজাতির জন্য প্রযোজ্য বা যুক্তি অনুযায়ী স্থাপিত কোন ন্যায়পরায়নতার কথা বলেননি। তা আবার কোন কাজের পুরস্কার বা অন্যায় করার জন্য শাস্তির কথা উল্লেখ করেননি। অন্য অর্থে বলা যায়, তিনি ন্যায্যতা বলতে যা বুঝাতে চান তা হল, এটা মানুষের প্রাপ্য কিছু নয়, কিন্তু তা হল 'ঈশ্বরের কাজ' যা সব নিয়ম ও বন্ধনের উর্ধ্বে রেখে আমাদের বুঝতে হবে। এটা হল 'ঈশ্বরের ভালবাসা' যা অপরিমেয় এবং ক্ষমাশীল যা শুধু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশীয় যন্ত্রণা ও মৃত্যুর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

পলের ন্যায্যতা কোন্ বিরোধী ধারণা ?

পল ন্যায্যতার বিষয়ে যে ধারণাটি প্রকাশ করেছেন তা আমাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে স্ববিরোধী মনে হতে পারে। প্রাথমিকভাবে তা স্ববিরোধী মনে হলেও পরবর্তীতে তা সত্যি বলে প্রতিপন্ন হয়। তাই তার এই ধারণাটি সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে ঐশবাণীকে ভিত্তি করে তা পর্যালোচনা করতে হবে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও বিধান শুধুমাত্র ঈশ্বরের ভালবাসার মাধ্যমে

মানুষের জীবনে কার্যকর হতে পারে। অপরদিকে মানুষ ঈশ্বরকে একমাত্র মুক্তিদাতারূপে তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার যোগ্য করে নিজেকে গঠন করে। এর পেছনে মানুষের এই বিশ্বাস কাজ করে যে, সে অযোগ্য হয়েও ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র। তাই দেখা যায় যে, ন্যায্যতার সাধারণ অর্থ ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন অর্থ প্রকাশ করে না কারণ তার ন্যায়পরায়নতা সব পার্থিব বিষয়ের ঊর্ধ্বে।

ন্যায্যতা ও ভালবাসা

বিধি-বিধান, আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যক্তি ও স্থানে ভিন্ন হতে পারে। তা হলে ন্যায্যতা নমনীয়। কিন্তু ভালবাসা ন্যায্যতার ধারক হিসাবে সকলের জন্য এক ও অভিন্ন। ন্যায্যতা পার্থক্য রচনা করতে পারে কিন্তু ভালবাসা সর্বদা সমান। ভালবাসার কাছে কোন মনিব-কর্মচারী, পুরুষ-মহিলা, শিশু বা বয়স্ক এভাবে কোন পার্থক্য রচনা করা যায় না। ভালবাসা সকলকে সমানভাবে দান করে। এ ব্যাপারে পল স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সমঅধিকার সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ দান করেন (১করি ৭:৩-৫)। এখানে যদিও বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তা কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিধি নিয়মের অন্তর্ভুক্ত; পার্থিব, পৃথিবীর নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত, ভালবাসা দ্বারা নয়। এটা দ্বারা সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় উপস্থাপিত হয়। কিন্ত পল এখানে যা বুঝাতে চান তা হল, ঈশ্বর সর্বকর্তৃত্বের অধিকারী, এমনকি সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় বিধানের উপর তিনি কর্তৃত্ব করেন। তাই রাষ্ট্রীয় নিয়ম মেনে আমরা যেন ঐশ্বরিক কর্তৃত্বকে মেনে নিই (রোমীয় ১৩:১-২)। তিনি আরো বলেন যে, ভাল-মন্দ যদিও নৈতিকতার বিষয়, তা যেন আমরা আমাদের বিবেকের উপর নির্ভর করে অনুসরণ করি। খ্রীষ্টান হিসাবে আমরা সত্যের অনুসারী এবং মন্দতার বিরোধী। তাই পার্থিব ন্যায্যতাকে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। পল বলেন, 'পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না, কারণ পরকে যে ভালবাসে, সে বিধান সম্পূর্ণই সার্থক করেছে" (রোমীয় ১৩:৮)। তিনি সাধারণ ন্যায্যতার ঊর্ধ্বে ভালবাসাকে স্থান দিয়েছেন।

ন্যায্যতা কোন কিছুকে উন্মুক্ত করে দেয় না বরং সব-কিছুকে একটি নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ রাখে। এটা শুধুমাত্র যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করে এবং অযোগ্যকে শাস্তি প্রদান করে। ভালবাসা শুধুমাত্র যোগ্য ব্যক্তিকেই নয়, অযোগ্য ব্যক্তিকেও সমানভাবে গ্রহণ করে। এটাই হলো ভালবাসার আশ্চর্য কাজ। অযোগ্য ও পাপী মানব জাতির জন্য যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসা হল সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

ন্যায্যতা যুক্তিসিদ্ধ বিষয় ও বাস্তবভিত্তিক এবং অব্যক্তিকেন্দ্রিক। ভালবাসা মানুষকে প্রাধান্য দান করে কারণ মানুষ এই পৃথিবীর সব নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে স্থান পায়। ভালবাসা সবসময় ন্যায্যতাকে পরাভূত করে। তা সত্ত্বেও ন্যায্যতা নিম্নতর কোন বিষয় নয়। ন্যায্যতা তার নিজের স্থানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যেখানে মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করে। মানুষ যতদিন এই নীতিমালার মধ্যে বসবাস করবে ততদিন সে ন্যায্যতাকে অস্বীকার করতে পারবে না। পলের ধারণা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ন্যায্যতার পাশাপাশি ভালবাসা একান্ত অপরিহার্য। ভালবাসা যেখানে শুরু হয়, সেখানে ন্যায্যতা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভালবাসা ন্যায্যতার সকল বিধি-নির্দেশ পূর্ণ করে তখনই যখন ন্যায্যতা ভালবাসা গ্রহণে প্রস্তুত থাকে।

পলের ন্যায্যতার আধ্যাত্মিকতা

পল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যারা ন্যায্যতার জন্য উদগ্রীব তারা তা অর্জন করবে এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বর ন্যায়বান (রোমীয় ৩:৫-৮)। তিনি আরো বলেন যে, যারা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ন্যায়পরায়নতা প্রদর্শন করে তারাই বেঁচে থাকবে (রোমীয় ৩১:১৭৫)। ঈশ্বরের সামনে ন্যায়পরায়নতা কখনোই শেষ হবে না। তাই তাঁর ন্যায়পরায়নতা মানুষের পাপের মুক্তি কামনা করে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সেই ন্যায়বান যে তাঁর মুক্তিদায়ী পরিকল্পনা ও কাজকে গ্রহণ করে। তাঁর প্রতি আমাদের বাধ্যতাই আমাদেরকে ন্যায়বান হতে সাহায্য করে (রোমীয় ৬:১৬)। পল মাঝে-মধ্যেই ন্যায্যতা বলতে বিশ্বাসের ন্যায্যতার কথা বোঝান যা ভালবাসার উপর স্থাপিত। এই ন্যায্যতা মানুষকে মুক্তি দান করে। শুধু মানুষই এই ন্যায্যতা বুঝতে

পারে। তাই মানুষের জীবনে ভালবাসা একটি অপরিহার্য উপাদান যা আমরা ন্যায্যতার সাথে যুক্ত করে মানবমুক্তির উপায় উদ্ভাবন করতে পারি। ন্যায্যতা মানুষের প্রাপ্য ও অধিকার। তবে ভালবাসা এর সাথে মিলে অধিকারের পূর্ণতা দান করে। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে কোন পরিকল্পনা সৃষ্টি করেননি, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তার এই সৃষ্টির পেছনে ভালবাসা ছিল। তিনি শুধু ভালবাসা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করেননি বরং ভালবাসার জন্য তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই পারস্পরিক ভালবাসার লেনদেন আমাদের মধ্যে ন্যায্যতার জন্ম দেয়। একজনের ভালবাসা প্রদানে অন্যজন পূর্ণ হয়, এবং এক জনের পূর্ণতায় অন্যজন জীবন লাভ করে।

ন্যায্যতা একটি ঐশ আশীর্বাদ

যীশু খ্রীষ্ট তার বাণীতে ঈশ্বরের উপর স্থির বিশ্বাসকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন যেখানে আইনকানুনের বিষয়টি কম গুরুত্ব পেয়েছে। যীশু ন্যায্যতার কথা বলতে গিয়ে সাধারণত 'দরিদ্র', 'নম্র', 'পাপী' এই সকল বিষয়কে টেনে এনেছেন। তিনি নিজে বিশ্বাসকে সত্যিকারের ন্যায়পরায়নতা হিসাবে গণ্য করেছেন এবং পাপীকে আখ্যায়িত করেছেন ন্যায়বান ব্যক্তি ও নম্র ব্যক্তিকে দিয়েছেন ঐশরাজ্যের অধিকার। সাধু পল তার মন পরিবর্তনের পূর্বে বিধানের ন্যায্যতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন (ফিলিপীয় ৩:৬)। মানুষ এ ধরনের ন্যায়পরায়নতা অর্জন করে তার ভাল কাজের অনুপাতে (রোমীয় ৯:৩০; ১০:৩)। তাই এখানে প্রশ্ন করা যায় যে, ন্যায্যতা কোথা থেকে আসে, বিধান থেকে (রোমীয় ১০:৫; গালাতীয় ২:২১; ফিলিপীয় ৩:৯) বা কাজের পরিপ্রেক্ষিতে (রোমীয়৩:২০; ৪:২; গালাতীয় ২:১৬)। পল তার মনপরিবর্তনের পরপরই এ ধরনের ধারণা থেকে মুক্তি পাননি বরং তার কিছু কিছু পত্রে ইহুদীদের ন্যায্যতার ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু আন্তিয়োখে পলের ন্যায্যতার ধারণাটি একটি নতুন মোড় নেয়। এখানে তিনি দু ধরনের ন্যায্যতার কথা উল্লেখ করেন (গালাতীয় ২:১০)। মানুষ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বর তাকে ধার্মিকতা দান ও মুক্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেন। তাই মানুষ শুধুমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমেই ঈশ্বরের দয়ার পাত্র হয়ে ওঠে। পলের জীবনে এ ধরনের উপলব্ধি আমাদের বর্তমান খ্রীষ্টীয় জীবনের পরিচালক।

পল প্রাথমিক প্রচার জীবনে পাপের মুক্তির চেয়ে 'ঈশ্বরের রোষ' এর উপর বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন। পরে তিনি ইহুদীদের ন্যায্যতার ধারণাকে বিরোধিতা করে ন্যায্যতাকে একটি ঐশ আশীর্বাদ হিসাবে গণ্য করেন । তিনি বলেন যে, ঐশ ন্যায্যতা স্বর্গ হতে আগত (রোমীয় ১:১৭; ৩:২১; ১০:৩) এবং তা মানুষের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। ঐশ ন্যায্যতা মানুষের সাথে ঈশ্বরের যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে সেই সন্ধির প্রতি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার মধ্যে নিহিত। অন্য কথায় বলা যায়, তাঁর দয়ার মধ্যেই তা নিহিত ও তাঁর ন্যায়পরায়নতা হল ঐশ্বরিক দয়া (রোমীয় ৩:২৫)। ঈশ্বরের এই দয়া শুধুমাত্র তার বিচারকার্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না বরং তা মানুষের মুক্তির পরিকল্পনার মধ্যে বিদ্যমান।

ন্যায্যতা পবিত্র আত্মার কাজ

পল বলেন যে, যারা পবিত্র আত্মাকে সঙ্গে করে জীবন যাপন করে তারা বিধান ভঙ্গ করে না বরং তা পূর্ণ করে (গালাতীয় ৫:১৩-১৫; রোমীয় ৮:৪; ২:২৬-২৯)। যখন পল খ্রীষ্টের বিধান সম্পর্কে কথা বলেন তখন তিনি পরস্পরের প্রতি সাহায্যের বিষয়টি একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করেন (গালাতীয় ৬:২) কয়েকটি ক্ষেত্রে পল নির্দেশ প্রদান করেন যাতে অন্যেরা তাদের শিক্ষাগুরু ও অন্যান্য ভাইদের প্রতি দয়া দেখায় (গালাতীয় ৬:৬; ৯-১০)। এই ধরনের নির্দেশ মানুষের জীবনধারার বিরোধী নয় বরং পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত। ন্যায্যতা দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের প্রয়োজন সর্বপ্রথম আসে। একজন বাধ্যতামূলক ভাবে অন্যজনকে সাহায্য করবে তা নয়। কিন্তু পল বলেন যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা সন্তোষজনক আমরা যেন তাই করি (ফিলিপ্পীয় ১:৯-১০)। অন্যভাবে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, পবিত্র আত্মায় আমরা যেন নতুন জীবন লাভ করি যা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততার পরিচয়। যীশু খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা পবিত্র আত্মাকে পেয়েছি তাই পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনে স্থান দেওয়াটাই আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্য কোন নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ নয়, তা

ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ন্যায়পরায়নতা ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

ন্যায্যতা হল পবিত্র আত্মার ফল। ভালবাসা পবিত্র আত্মার দান হিসাবে ন্যায্যতাকে পূর্ণতা দান করে। ভালবাসাকে মানদণ্ড করে মানুষ যখন তার দায়িত্বকর্ম পরিচালনা করে তখনই ন্যায্যতার সৃষ্টি হয় (১করি ৬:৭)। এ ব্যাপারে পল বলেন, যে-কেউ কোন অন্যায় কাজ করে বা আমাদের সাথে প্রতারণা করলে আমাদের যে ক্ষতি হয়, ভালবাসার নাম নিয়ে আমরা যদি আমাদের অধিকার জোর করে আদায় করি তবে তা অন্যায্যতার সৃষ্টি করে। তাই পল বলেন যে, ন্যায্যতার কাজ হল পবিত্র আত্মার কাজ (গালাতীয় ৫:২২-২৩)। আমরা নিয়মের ন্যায্যতাকে জয় করি পবিত্র আত্মার শক্তিতে। বিধান আগে আসে না, আসে পবিত্র আত্মা (রোমীয় ৮:৪)। আমরা পবিত্র আত্মাকে পেয়েছি কারণ ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন। আমরা কোন বিধান দ্বারা পবিত্র আত্মাকে পাইনি (রোমীয় ৩:২০,২৮)। ন্যায়পরায়নতা শুধুমাত্র নিয়ম দ্বারা পাওয়া যায় না, তা পবিত্র আত্মার শক্তিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশ মণ্ডলীতে ন্যায্যতা

ন্যায্যতা ও বাংলাদেশ মণ্ডলী

আমরা প্রতিদিনই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ন্যায্যতা লংঘনের বিভিন্ন সংবাদ দেখতে পাই। বর্তমানে বাংলাদেশের বহুল প্রচলিত কথা হল, 'ঘুষ ছাড়া কিছুই হয় না'। বাংলাদেশে ন্যায় বিচার পেতে হলে অন্যায় পথ অবলম্বন করতে হয়, এটাই যেন চিরন্তন সত্য। ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, যোগ্যতা এসব কিছু মনে হয় সব-কিছুর উর্ধ্বে। দারিদ্র্য, স্বল্পবেতন, নারী নির্যাতন, শিশু শ্রম, সামাজিক অসমতা, দেশীয় সম্পদের অসম বন্টন, রাজনৈতিক সুবিধা, হত্যা ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশ অন্যায্যতার গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে আছে।

এরূপ পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টমণ্ডলী এই অন্যায্যতার কাঠামোকে এড়িয়ে যেতে পারেন। আমাদের খ্রীষ্টান সমাজও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো 'অধিকারী' ও 'অধিকারহীন' বিভক্তিটা মেনে নিয়েছে। অনেক সময় আমরা বাংলাদেশের অন্যায্যতার মূল কারণ সম্বন্ধে সচেতন নই বরং আমরা 'যা যেভাবে আছে' সেভাবেই গ্রহণ করি। আমরা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করি না। বাস্তবতা এরূপ হলেও মণ্ডলী সব সময় ন্যায্যতার পক্ষে কথা বলে ও কাজ করে। শান্তি ও ন্যায্যতাকে তা মণ্ডলী একটি বিশেষ প্রৈরিতিক কাজ হিসাবে গণ্য করে।

বাংলাদেশের অন্যায্যতা

বাংলাদেশে যে সকল ক্ষেত্রে অন্যায্যতা বিরাজমান সেগুলি অধিকাংশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ে। বাংলাদেশের অন্যায্যতার মূল সমস্যা উদ্ভাবন করা খুবই কঠিন কাজ। কারণ দেখা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রের সমস্যা পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে দেখা যায় যে, অধিকাংশ জনসমষ্টি অন্যায্যতার শিকার। অধিকাংশ জনগণ সম্পত্তি লাভের অধিকার, কাজ করার সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার ও নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এদেশের জনসংখ্যা অধিক হওয়াতে মাথাপিছু জমির পরিমাণ খুবই অল্প। তাছাড়া অধিকাংশ ভূমির মালিকানা গুটিকতক ধনীর হাতে। সমাজের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা আর নেই বললেই হয়; খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু অপহরণ ইত্যাদি সারা বাংলাদেশ জুড়েই বিদ্যমান। তাছাড়া ন্যায্য পারিশ্রমিক, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে মুক্ত থাকার অধিকার, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। তাই দেখা

যায়, সমাজের মধ্যে একটি 'অন্যায্যতার কাঠামো' গড়ে উঠেছে যা থেকে মুক্তি লাভ করা খুবই কষ্টকর। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, আইনের আশ্রয় নেওয়ার অধিকার, ভোটদানের অধিকার, দুঃখ-দুর্দশা, স্বেচ্ছাচারী নিরোধ, অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তির অধিকার ইত্যাদি প্রত্যেক মানুষের রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের এ অধিকারগুলি পূরণ হচ্ছে না। ফলে অন্যায্য সামাজিক কাঠামো থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছি না। মানুষের এ সকল অধিকারগুলি শুধুমাত্র কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। কোন কোন সময় মানুষের সামবেশ করার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ধর্মপালনের অধিকার, রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে জনগণের জন্য যে সকল অধিকার প্রদানের কথা তা দেখা যায় না। নারীর অধিকারের কথা বলতে গেলে দেখা যায় যে, নারীরা অধিকারের চেয়ে অত্যাচার বেশী সহ্য করে। কোন কোন সমাজে যৌতুক প্রথা অসহনীয় বাধা হয় যা পরবর্তীতে নির্যাতন ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া ধর্ষণ, বিবাহ বিচ্ছেদ, নারীদের ব্যবসায়িক ফায়দা লুটানোর কাজে ব্যবহার, যৌন শোষণ ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুরা উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

তাই বাংলাদেশের এই অন্যায্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মণ্ডলী কী করতে পারে? মণ্ডলী কি শুধু ধর্মীয় কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবে নাকি সমাজের সর্বস্তরে মানুষের জন্য কিছু করতে পারে?

অন্যায্যতা মণ্ডলীর উদ্বেগ

ভালবাসার ও সেবার কাজ ঐতিহাসিকভাবে মণ্ডলীর প্রৈরিতিক কাজের অংশ। মণ্ডলীর ন্যায্যতার কাজ সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। সাধু পল ন্যায্যতার কথা বলতে গিয়ে যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসার কথা প্রচার করেছেন। তাই মণ্ডলীর ন্যায্যতার কাজের ক্ষেতে সেবাকাজ ও ভালবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে মণ্ডলী সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকে। দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের কথা অনুসারে, "যার দুটো জামা আছে সে বরং যার জামা নেই তাকেই একটা দিক, তেমনি যার খাবার আছে সে-ও তা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিক। তোমরা কারো কাছ থেকে জুলুম চালিয়ে কোন কিছু পাবার চেষ্টা করো না" (লুক ৩:১০-১৪)। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য অনেকে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই বুঝা যায় যে, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা হল, মণ্ডলীর জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়। বিশ্বের বেশ কিছু অন্যায্য বিষয়ের পিছনে যেমন ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত আন্দোলন মণ্ডলীর বাইরে সংগঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর সবকিছু পাল্টে যায়।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার ভক্তসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ বিষয়ক ৬নং নির্দেশনামায় বলা হয়, "মণ্ডলীর প্রেরণকার্য মানুষের মুক্তির সাথে জড়িত। আর এই মুক্তি খ্রীষ্টবিশ্বাস ও তাঁর প্রসাদের মধ্য দিয়েই মানুষের কাছে আসে"। বর্তমানে মণ্ডলীর ন্যায্যতা সংক্রান্ত কাজের মূল লক্ষ্য হল মানুষের মুক্তি, সকলপ্রকার অন্যায্যতা, পাপময়তা, বিরোধ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি থেকে। আদি মণ্ডলী যদিও শুধুমাত্র মানুষের 'আধ্যাত্মিক' মুক্তির কথা প্রচার করত, বর্তমানে কিন্তু সমগ্র পার্থিব বিষয়ের নবায়নও মণ্ডলীর কাজের অংশ। তাই মণ্ডলী যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসাকে কেন্দ্র ক'রে পার্থিব কাঠামোতে সার্বিক পরিবর্তন আনয়ন করে জনগণের আধ্যাত্মিক মুক্তি আনয়নের কাজে যুক্ত। আজ নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হচ্ছে, ধর্ম, বর্ণ, নৈতিক ব্যবস্থা, মানবসমাজকে পর্যন্ত ধ্বংস করতে বিভিন্ন অপশক্তির প্রসার হচ্ছে। এমতাবস্থায় মণ্ডলীর কাজ হল খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধগুলি রক্ষা করা, সার্বিকভাবে তা মণ্ডলীতে প্রয়োগ করা। সর্বপরি একটি 'ন্যায্যসমাজ' গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ মণ্ডলীর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা ও সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশ মণ্ডলী তার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে দেখায় যে, সে ন্যায্যতার পক্ষে কাজ করছে। ধর্মীয় কারণে সবক্ষেত্রে মণ্ডলীর পক্ষে কাজ করা সম্ভবপর নয়। তারপরও যে-সকর ক্ষেত্রে মণ্ডলী কাজ করে যাচ্ছে, তা কিন্তু মোটেই ছোট করে দেখার নয়। বাংলাদেশ মণ্ডলীকে মানুষের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব দুটি দিক বিবেচনা করে কাজ করতে

হয়। বাংলাদেশ মণ্ডলী যে সকল ক্ষেত্রে মানুষের ন্যায্যতার জন্য কাজ করছে, তা নিম্নরূপ :

ক) সমাজের মূল্যাবোধ গঠনের জন্য মণ্ডলীর পক্ষ থেকে যুবক-যুবতী, বয়স্কদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের মাধ্যমে তাদের সচেতন করা হয়।

খ) সমগ্র বাংলাদেশে মণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি সর্বোত্তম শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করছে।

গ) স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা মণ্ডলী করে থাকে। যে সকল স্থানে মণ্ডলী এসকল কাজ করছে, সে স্থানগুলিতে স্বাস্থ্য সচেতনতার ক্ষেত্রে বিশাল পরিবর্তন দেখা যায়।

ঘ) বর্তমানে মণ্ডলী নারী, শিশুদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বিশেষ করে শিশুদের বিনামূল্যে বিভিন্ন স্থানে স্কুলের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

ঙ) মহিলাদের বেকারত্ব দূরীকরণ ও তাদেরকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের যেমন সেলাই, হাতের কাজ, নার্সিং ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

চ) অনেক জায়গায় জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। জনগণকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সচেতন করা হচ্ছে।

জ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মণ্ডলী সর্বপ্রথম নিঃস্বার্থভাবে তার সাধ্যমত দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়। মণ্ডলী থেকে অনেক স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা তাদের সাহায্যে এগিয়ে যায়।

ঝ) মানুষের বাসস্থানের জন্য অসংখ্য দুঃস্থ পরিবারগুলিকে ঘর-বাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়।

ঞ) খ্রীষ্টমণ্ডলী আজ শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তধর্মীয় সংলাপ ও অন্য ধর্মের লোকদের সাথে কাজ করার জন্য ইত্যাদি মাধ্যমগুলি বেছে নিয়েছে।

ট) বর্তমানে মণ্ডলী ভূমিহীন ও আদিবাসীদের সাথে কাজ করছে। তাদেরকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করছে, তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলছে, যাতে ভবিষ্যতে তারা নিজেরা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়।

মণ্ডলী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে না কারণ মণ্ডলী রাষ্ট্রীয় কাজে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নয়। তবে মণ্ডলী আজ সামাজিক অন্যায্যতা দূরীকরণে জন্য সবচেয়ে বেশী অবদান রেখে যাচ্ছে।

উপসংহার

আমরা খ্রীষ্টানগণ যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে শর্তহীন ভালবাসা পেয়েছি। আমরা তাঁর এই ভালবাসার কোন প্রতিদান দিতে পারব না। তাই আমরা যখন খ্রীষ্টের এই ভালবাসা নিঃশর্তভাবে অন্যকে দান করি তখনই আমরা আমাদের জীবনে ন্যায়পরায়নতার পরিচয় দিয়ে থাকি। আমাদের জীবনে যখন আমরা ন্যায়পরায়নতার অনুশীলন করব তখন সমাজেও আমরা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারব। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর ভালবাসা সকলের জন্য; ন্যায্যতার জন্য আমাদের সংগ্রাম যীশু খ্রীষ্টের আহ্বানে সাড়াদানের একটি অপরিহার্য অংশ। সাধু পল যীশুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ন্যায্যতার কথা বলেছেন। তাই পরিশেষে বলা যায়, যীশু খ্রীষ্টের নায্যতার আহ্বানে সাধু পল সাড়া দিয়েছেন, তেমনি আমাদের উচিত যীশু খ্রীষ্টের এই আহ্বানে সাড়া দান করা।